



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 220 - 226

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

কল্লোল লাহিড়ীর ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’ উপন্যাসে দেশভাগ, স্মৃতি ও নারীসত্তার সংকট ও উত্তরণ : একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

কৃষান ত্রিপুরা

অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ, আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা

এবং

গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: krishantp25@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Partition and
Uprooting,
Memory and Past
Journeys,
The Crisis of
Femininity,
Transition and
Self-Reliance,
Refugee Life,
Patriarchal
Deprivation,
Marginal Struggle,
Annapurna Being.

Abstract

Kallol Lahiri's 'Indubala Bhaater Hotel' is not just a story about a small eatery, it is much more. At its core is the horrors of Partition, the deep pain of being rootless, and a poignant reflection on the intense struggle for survival and dignity of a marginalized woman.

The story follows Indubala, who leaves her beloved ancestral home in Kalapota and takes refuge as a refugee in the unfamiliar streets of Kolkata's chenu matir gali. Life is unimaginably cruel to her-she faces the crushing burden of a patriarchal society, the brutality of a tyrannical husband, and the sudden, isolating darkness of being widowed at a young age. But instead of breaking down, Indubala finds a lifeline in the only things she has left: a deep connection to the memories of her homeland and an incredible talent for cooking.

With Lakshmi, another marginalized woman from Bihar, who deeply understands her struggle, Indubala starts her rice hotel. The fire in her kitchen becomes a silent ordeal. Through cooking, she realizes her lost past, the grief of losing loved ones, and the deep sorrow of historical disasters like the Language Movement and the Liberation War, and ultimately builds an indomitable, independent being.

While other women in the novel, like Jyotsnamayi and Nandita, also protest in the ways of their respective generations, Indubala's rebellion is unique-it is silent, yet utterly unwavering. She refuses to be the helpless, rejected widow that society wants her to be. Instead, through sheer determination, hard work, and deep humanity, she transforms into an "Annapurna"-a loving nurturer for her community.

Ultimately, Indubala's journey is not just a story of overcoming personal grief. It serves as a beautiful and enduring metaphor, showing how ordinary women caught in the brutal conflict of patriarchy and drawn boundaries can rise from the ashes and fully reclaim their lives.

Discussion

মানুষের জীবনে শেকড়ের টান আর স্মৃতির গভীরতা পরিমাণ করা বড়ই কঠিন। দেশভাগ, ভিটেমাটি হারানোর যন্ত্রণা এবং শেকড়চ্যুতির হাহাকার মানুষকে আজীবন তাড়িয়ে বেড়ায়। কালের নিয়মে মানুষ হয়তো নতুন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেয়, কিন্তু তার অবচেতন মন চিরকাল এক অদেখা সুতোর টানে বাঁধা থাকে ফেলে আসা অতীতের সাথে। এই হারানো অতীতকে কেউ ধরে রাখে গানে, কেউ সাহিত্যে, আর কেউ বা প্রাত্যহিক রান্নার ঘ্রাণে। মানুষের ঘ্রাণশক্তি এবং স্বাদের সাথে যে স্মৃতির এক অচ্ছেদ্য নাড়ির টান রয়েছে, সেই ধ্রুব সত্যটিকে উপজীব্য করেই একুশ শতকের বিশিষ্ট লেখক কল্লোল লাহিড়ী তাঁর ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এক শেকড়ছাড়া, প্রান্তিক নারীর অতীতচারণ আর জীবনসংগ্রামের আখ্যানকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। রান্নার সাথে স্মৃতির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মাথায় রেখেই ১৭৫ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটিকে ঔপন্যাসিক মোট আটটি অংশে ভাগ করেছেন এবং প্রতিটি অংশের নামকরণ করেছেন এক-একটি রান্নার পদের নামে- কুমড়া ফুলের বড়া, বিউলির ডাল, ছাঁচড়া, আম তেল, মালপোয়া, চিংড়ির হলুদ গালা ঝোল, চন্দ্রপুলি এবং কচু বাটা।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হল ইন্দুবালা। ইন্দুবালার জীবনের করুণ ট্রাজেডির সূচনা ঘটে তার একদম কৈশোরেই, যখন সে সবেমাত্র জীবনের অর্থ বুঝতে শিখছে। পূর্ববঙ্গের খুলনার কলাপোতা গ্রামে কপোতাক্ষ নদের তীরে এক স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে সে বেড়ে উঠছিল। সেখানে ছিল তার বাঁধনহারা শৈশব, খোলামেলা উঠোন, এবং গ্রামের ছেলে মনিরুলের সঙ্গে তার প্রথম প্রেমের এক অব্যক্ত মিষ্টি অনুভূতি। কিন্তু সমাজ ও ধর্মের নিষ্ঠুর নিয়মের দোহাই দিয়ে তার সেই সাজানো স্বপ্নগুলোকে নিমেষেই ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। বাবা ব্রজমোহন কলকাতার বনেদি পরিবারের মোহ এবং পাত্রপক্ষের মিথ্যা আশ্বাসে ভুলে গিয়ে তাঁর আদরের মেয়েকে তুলে দেন বৃদ্ধ বয়স্ক মাস্টার রতনলাল মল্লিকের হাতে।

বিয়ের পর সবুজ গ্রাম আর চেনা নদী পার হয়ে একবুক শূন্যতা নিয়ে ট্রেনে চেপে ইন্দুবালা এসে পৌঁছায় কলকাতার ছেনু মিত্রের লেনের এক স্যাঁতসেঁতে ও দমবন্ধ করা পরিবেশে। এই নতুন ঠিকানায় পা রাখতেই তার জীবনের এক চরম ও তিক্ত সত্য উন্মোচিত হয়। ফুলশয্যার রাতেই সে বুঝতে পারে, তার স্বামী কোনো আদর্শবান মানুষ নন, বরং তিনি একজন বয়স্ক, মদ্যপ এবং জুয়াড়ি ‘দোজবরে’ (দ্বিতীয়বার বিবাহিত) ব্যক্তি। পাত্রপক্ষ সুকৌশলে এই কথাগুলো গোপন রেখেছিল। ইন্দুবালার মনে হয় সে যেন এক অন্ধকার আবর্তনে এসে পড়েছে, যেখান থেকে মুক্তির আর কোনো উপায় নেই। এই অচেনা শহরে তার জীবন এক জীবন্ত নরকে পরিণত হয়। একদিকে ছিল বদমেজাজী শাশুড়ি শেফালীরানীর তীক্ষ্ণ গঞ্জনা, যিনি কথায় কথায় তাকে ‘বাঙাল’ বা ‘রিফিউজি’ বলে অপমান করতেন -

“উঠতে বসতে ইন্দুবালাকে ‘বাঙাল’ বলাটা এই বাড়ির রেওয়াজ ছিল। আর ‘রিফিউজি’ তো তখন কলকাতার আকাশে বাতাসে। কান পাতলেই শোনা যেত। শাশুড়িই ধরিয়ে দিয়েছিলেন ‘বাঙাল’ শব্দটা। পরে বাড়ির লোকের অভ্যেসে পরিণত হয়। মানুষকে এভাবে যে সম্বোধন করা যায় সেটা ইন্দুবালা এপারে না এলে বুঝতে পারতেন না কোনোদিনও।”^১

অন্যদিকে ছিল স্বামী রতনলালের পাশবিক অত্যাচার। স্বামী হিসেবে সংসারের কোনো দায়িত্ব পালন তো দূরের কথা, রতনলাল উলটে ইন্দুবালার গায়ের গয়না একে একে চুরি করে তার নেশার টাকা জোগাড় করত এবং রাতের অন্ধকারে তার ওপর বাঁপিয়ে পড়ত। ইন্দুবালা এভাবেই শাশুড়ির মানসিক অপমান আর স্বামীর শারীরিক লালসা ও শোষণের যাতাকলে পড়ে দিনের পর দিন নিঃশব্দে পিষ্ট হতে থাকে।

উপন্যাসে ইন্দুবালার নিজস্ব জীবন যন্ত্রণার সমান্তরালেই অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ এক বিয়োগান্তক ইতিহাস। সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতিকে তোয়াক্কা না করে রাতারাতি যখন একটি সুজলা-সুফলা ভূখণ্ডকে দুভাগে টুকরো করে দেওয়া হয় এবং চিরকালের চেনা মাটি বিদেশ হয়ে যায়, তখন সেই কৃত্রিম বিভাজনকে মেনে নিতে পারেনি সাধারণ মানুষ। এই ক্ষোভ ও ছিন্নমূল মানুষের শাস্ত হাহাকার মূর্তি হয়ে উঠেছে উপন্যাসে ইন্দুবালার দাদুর চরিত্রটি। কপোতাক্ষ নদের ওপারে তাকিয়ে থাকা বৃদ্ধ দাদুর সেই আক্ষেপ যেন সমগ্র মানবজাতির এক অমোঘ প্রতিবাদ -

“এই স্বাধীনতাই কি চেয়েছিলাম আমরা? এই স্বাধীনতার স্বপ্নই কি দেখেছিলেন চট্টগ্রাম অজ্ঞাগার অভ্যুত্থানের বীর শহীদ মাস্টারদা সূর্য সেন? ...দেশ কখনও ভাগ করা যায় নাকি? এটা কি তোমার লাউটা, মুলোটা কাটলেই ভাগ হয়ে গেল?”^২

একইভাবে ইন্দুবালার জীবনে বিরহ ও শোকের সাথে জড়িয়ে যায় ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। কৈশোরে যে মুসলিম ছেলে মনিরুলের সাথে ইন্দুবালার অদৃশ্য প্রেমের বার্তা ছিল, সে যুক্ত হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং মুক্তি বাহিনীর সাথে। কলকাতায় আত্মগোপনকালীন সময়ে মনিরুল ইন্দুবালার সাথে দেখা করতে এসে বলেছিল -

“একটা স্বাধীন দেশ পেতে চলেছি ইন্দু ... আর কোনো ভাবনা নেই...”^৩

কিন্তু স্বাধীনতার সূর্যোদয় দেখার আগেই পাকিস্তানি মিলিটারির হাতে ধরা পড়ে শহীদ হয় মনিরুল এবং কপোতাক্ষের নদীতে তার নিখর দেহের ব্যাগে পাওয়া যায় ইন্দুবালার হাতে সেলাই করা সেই স্বাধীন বাংলাদেশের একটি কাপড়ের নকশা। অন্যদিকে, খান সেনাদের জ্বালানো নির্মম আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ইন্দুবালার জন্মভিটে কলাপোতা, মারা যায় তাঁর মা ও আদরের ছোট ভাই। মাতৃভাষার অধিকার এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য সাধারণ মানুষের এই আত্মত্যাগের বর্ণনা ঔপন্যাসিক তাঁর উপন্যাসে এক পরম বেদনার ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন -

“বাংলা ভাষার রাষ্ট্র হোক, এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে এক আশ্বিনের রাতে শিউলির গন্ধে।”^৪

এরপর উপন্যাসে আমরা দেখতে পায় অল্প বয়সে তিন সন্তানকে নিয়ে বিধবা হয় ইন্দুবালা। বিধবা হওয়ার পর ইন্দুবালার জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। স্বামীর বাড়ির জ্ঞতি-কুটুম্বর সম্পত্তির লোভে শকুনের মতো তাঁকে ভিটেছাড়া করার জন্য ঘিরে ধরে। ঘরে যখন একদানা চাল নেই, ছেলেমেয়েগুলো খিদের জ্বালায় তারস্বরে কাঁদছে, ঠিক তখনই তাঁর জীবনে দেবদূতের মতো আসে বিহার থেকে আসা মাছওয়ালী লছমী। লছমী জোর করে তাঁর আঁচলে দুটি টাকা বেঁধে দিয়ে বলে -

“আজ তোমার বাড়িতে দুটো ভাত মুখে দেব মাজি। কছু মনে করো না। বারোটা পাঁচিশের ক্যানিং লোকাল ছুঁড়ে গেল যে। এখন দুটো পেটে না পড়লে বাড়ি ফিরতে সাঁঝ হয়ে যাবে। আর শলীল চলবে না মাজি।”^৫

এই দুটি টাকার বিনিময়ে ইন্দুবালা পেছনের বাগান থেকে কচি কুমড়াশাক তুলে এনে প্রাচীন শিলে সর্ষে বেটে রান্না করেছিলেন ‘কুমড়া ফুলের মিঠে বড়া’। লছমীর তৃপ্তি আর ভালোবাসার হাত ধরেই জন্ম নেয় ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’, যা পরবর্তীতে কালেক্টর অফিসের বড়বাবুর সৌজন্যে একটি হলুদ রঙের এনামেল বোর্ডের মাধ্যমে স্থায়িত্ব পায়। এই রান্নাই ছিল ইন্দুবালার স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার প্রথম পদক্ষেপ। এটি কেবল তাঁর অন্নসংস্থান ছিল না, বরং তা ছিল দেশভাগের ক্ষত আর স্বজন হারানোর তীব্র যন্ত্রণাকে চাপা দেওয়ার এক পরম হাতিয়ার।

ভাতের হোটেল প্রতিষ্ঠার পর ইন্দুবালার জীবনের দ্বিতীয় মহাকাব্যিক অধ্যায়টি শুরু হয় তাঁর তিন (দুই ছেলে এক মেয়ে) সন্তানদের একক প্রচেষ্টায় বড় করে তোলার কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। মল্লিক বাড়ির ক্ষয়ে যাওয়া নৈতিকতা এবং স্বামী রতনলালের চারিত্রিক স্থলনকে ইন্দুবালা খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁর সন্তানদের ওপর এই বাড়ির কোনো পূর্ব-পুরুষের কুৎসিত ছায়া পড়তে দেবেন না। এক পূর্ব বাংলার বিধবা নারী যখন গনগনে উনুনের সামনে সোনা মুগের ডাল আর ভাত ফোটাচ্ছেন, তখন তাঁর কঠোর অনুশাসনে বড় হয়ে উঠছিল প্রদীপ, সুদীপ আর ইতু। সন্তানদের নিজের হাতে বর্ণপরিচয় পড়িয়ে স্কুলে ভর্তি করার পাশাপাশি ছেলেদের হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন ঘরের কাজ, রান্না-বান্না ও বাসন মাজা।

তিনি কোনোদিন সন্তানদের সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করেননি, চোখের জল ফেলেননি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের কোনো পুরুষের করুণা ছাড়া, শুধুমাত্র নিজের রান্নার গুণ আর অদম্য জেদকে সম্বল করে এক প্রান্তিক নারীর নিজের সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার এই আশ্রয় যুদ্ধ বাংলা সাহিত্যে সত্যিই এক অনন্য দলিল।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বড় ছেলে প্রদীপ যখন ইন্দুবালাকে মৈত্রী এক্সপ্রেসে করে বাংলাদেশে ঘুরিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব দেয় এবং পাসপোর্ট করার কথা বলে, তখন ইন্দুবালার মনে এক অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তিনি পরদিন ভোরেই উড়িষ্যার খরাপীড়িত গ্রাম থেকে আসা তার সাহায্যকারী ধনঞ্জয়কে নিয়ে কলকাতা স্টেশনে ছুটে যান সেই মৈত্রী

এক্সপ্রেস নামক ধূসর-নীল রঙের ট্রেনটিকে দেখতে। কিন্তু ট্রেনের গায়ে হাত দিতেই ইন্দুবালাবাবুর অবচেতন মনে এক চরম সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি বুঝতে পারেন, এই আধুনিক ট্রেনটি তাঁর সেই সবুজ কাঁচা আমতেল রঙের অতীত ট্রেনটি নয়, যা তাঁকে তাঁর হারিয়ে যাওয়া শৈশব, কপোতাক্ষ নদের ঘাট, বোসদের পুকুর কিংবা তাঁর মা ও ভাইয়ের কোল ফিরিয়ে দিতে পারবে। যে দেশে তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকবার আর কেউ নেই, সেখানে পাসপোর্ট-ভিসার সিল মেরে পর্যটক হিসেবে যাওয়া তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত করেছিল। ইন্দুবালাবাবুর কাছে দেশ কোনো ভৌগোলিক মানচিত্র নয়, দেশ হল তাঁর মানুষগুলো। তাই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, পুরোনো সেই দেশে ফিরে যাওয়া মানে এক মহাশূন্যতার মুখোমুখি হওয়া। অতীতকে তিনি তাঁর হোটেলের রান্নার সুবাস আর স্মৃতির ‘আম তেল’-এর মধ্যেই জারিত করে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। এই কারণেই তিনি মৈত্রী এক্সপ্রেসে চড়ে বাংলাদেশে যাওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে ছেনু মিত্রের লেনের নিজের হোটেলে ফিরে আসেন, যেখানে তিনি তাঁর হারিয়ে যাওয়া মানুষদের খুঁজে পান রান্নার প্রতিটি পদে।

কল্লোল লাহিড়ীর এই উপন্যাসের আর একটি অন্যতম শক্তিশালী দিক হল নারীচরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তন ও বৈচিত্র্য। উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপটে ইন্দুবালাবাবুর একাকী সংগ্রাম ও নীরব আত্মত্যাগের কথা থাকলেও, তাঁর চারপাশে এমন দুটি নারী চরিত্রের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই, যাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের প্রতিনিধি হয়েও সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই চরিত্র দুটি হল ইন্দুবালাবাবুর ঠান্ডার শাশুড়ি জ্যোৎস্নাময়ী এবং ইন্দুবালাবাবুর ছোট ছেলে সুদীপের স্ত্রী নন্দিতা। এই দুই ভিন্ন মেরুর নারীর সাথে ইন্দুবালাবাবুর নীরব যাপনের তুলনামূলক আলোচনা উপন্যাসটিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে জ্যোৎস্নাময়ী চরিত্রটি এক অদম্য সাহস ও জেদের প্রতীক। নবদ্বীপের বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে বিবাহ করে খুলনার অজ পাড়াগাঁ কলাপোতায় এসে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি, বরং নিজের আত্মপরিচয়কে জোরালোভাবে তুলে ধরেছিলেন রান্নার মাধ্যমে। নদীর জলে পুণ্যস্নানের পর নদী থেকে তুলে আনা জ্যন্তু চিংড়ি দিয়ে তিনি বহুকাল বন্ধ থাকা মায়ের রান্না ঘরে ঢুকে রেখেছিলেন ‘চিংড়ির হলুদ গালা ঝোল’। এই রান্না কেবল একটি পদ ছিল না, এটি ছিল পিতৃগৃহে নিজের অস্তিত্বের সদস্ত জানান দেওয়া এবং মৃত মায়ের প্রতি এক অভিনব শ্রদ্ধাঞ্জলি। জ্যোৎস্নাময়ী বাবার কাছে সম্পত্তি বা শখের পুতুল না চেয়ে এক অদ্ভুত আত্মসম্মানবোধের সাথে বলেছিলেন -

“সারা বাড়ি কালাকানি হয়। এই বুঝি মেয়ে তার নিজের নামের সব সম্পত্তি চেয়ে নিল। ... জ্যোৎস্নাময়ী

অক্ষুটে তার বাবাকে বলে-একবার চিঠি লিখুন কলাপোতায়। তিনি যেন আমাকে এসে নিয়ে যান।”^৬

শুধু তাই নয়, নিজের অধিকার বুঝে নিতে তিনি গরুর গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে গিয়েছিল মায়ের রান্না ঘর, ডেয়রা, ঢাকনা, খুস্তি আর আমিষের বড় লোহার কড়াই। জ্যোৎস্নাময়ীর এই সাহসিকতা এবং রান্নাঘরকে নিজের প্রতিবাদের হাতিয়ার করার সাথে ইন্দুবালাবাবুর অদ্ভুত মিল রয়েছে। জ্যোৎস্নাময়ী যেমন মায়ের বন্ধ রান্নাঘরের কড়াইয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ইন্দুবালাবাবু ঠিক তেমনি তাঁর জীবনের সমস্ত অপ্রাপ্তি, শোক আর দেশভাগের যন্ত্রণাকে জয় করেছেন তাঁর ভাতের হোটেলের উনুনের আঁচ দিয়ে।

অন্যদিকে, আধুনিক নারীসত্তার এক উজ্জ্বল ও প্রতিবাদী রূপ হিসেবে উপন্যাসে উঠে এসেছে ছোট বউমা নন্দিতা। যে যুগে ইন্দুবালাবাবু সমাজ, ধর্ম ও লোকলজ্জার ভয়ে নিজের প্রথম প্রেম মনিরুলকে ভালোবাসার কথা মুখে বলতে পারেননি, সেই যুগের শেকল ভেঙে নন্দিতা হয়ে উঠেছে এক স্পষ্টবক্তা নারী। পরিবার যখন সুদীপের সাথে তার বিয়ে দিতে রাজি হয়নি এবং পাত্র দেখার জন্য বাড়িতে লাইন পড়েছিল, তখন কোনো ভয় না পেয়ে সে সোজা চলে এসেছিল ইন্দুবালাবাবুর ভাতের হোটেলে। নিজের ভালোবাসার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এক অপরিচিতা নারীর (ইন্দুবালা) রান্নাঘরে ঢুকে সে তার প্রেমের কথা অকপটে স্বীকার করেছে এবং সাহায্য চেয়েছে। নন্দিতার এই সাহসিকতা দেখে ইন্দুবালাবাবু নিজেই অবাক হয়ে নিজের ফেলে আসা অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। উপন্যাসে লেখক ইন্দুবালাবাবুর অন্তর্দৃষ্টিকে অত্যন্ত নিপুন ভাবে তুলে ধরেছেন -

“তাঁর কোনোদিন সাহস হয়নি বাড়িতে বলার যে, ভালোবাসেন মনিরুলকে। বিয়ে করতে চান। পালিয়ে বিয়ে করতে গিয়ে স্বর্ণলতাকে মরতে হয়েছিল পুকুরের ডুবে। মনিরুল কে ছেড়ে আসতে হয়েছিল কপোতাক্ষের তীরে। তাদের সবার প্রতিনিধি হয়েই কি মেয়ে তা এই সন্ধ্যাবেলায় তার কাছে এসেছে।”^৭ ইন্দুবালা সেদিন নন্দিতার মাঝে যেন এক নতুন যুগের নারীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর নিজের এই নীরবতাই হয়তো তাঁকে এবং মনিরুলকে চিরকালের বিরহের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, কিন্তু নন্দিতা তার সাহসিকতা দিয়ে তার ভালোবাসাকে জয় করেছে।

ইন্দুবালা, জ্যোৎস্নাময়ী এবং নন্দিতা— এই তিনটি চরিত্র আসলে নারীমুক্তির তিনটি ভিন্ন পর্যায়ের রূপক। জ্যোৎস্নাময়ী যেখানে নিজের জেদ আর আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর মায়ের রান্নাঘরের দখল নেওয়ার মাধ্যমে, নন্দিতা সেখানে সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের ভালোবাসাকে জয় করেছে মুখের ভাষায় ও নির্ভীক পদক্ষেপে। আর এই দুজনের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের ইন্দুবালা। তাঁর কোনোদিন সাহস হয়নি নিজের প্রেমের কথা মুখে বলার। লোকলজ্জার ভয়ে তিনি মনিরুলকে তাড়িয়ে দিলেও, সারা রাত জেগে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে তৈরি করেছিলেন চন্দ্রপুলি এবং ভোরের অন্ধকারে তা তুলে দিয়েছিলেন প্রেমিকের হাতে। ইন্দুবালার সংগ্রাম বাইরের পৃথিবীর সাথে নয়, বরং নিজের ভেতরের যন্ত্রণার সাথে। তাঁর প্রতিবাদ কোনো ক্লোপানে নেই, আছে তাঁর রান্নার সুবাসে, একাকীত্বে এবং তাঁর ভাতের হোটলে পাতা পাড়া শত শত ক্ষুধার্ত মানুষের সেবায়। কল্লোল লাহিড়ী অত্যন্ত নিপুণভাবে এই তিন প্রজন্মের তিন নারীর মানসিকতাকে এক সুতোয় বেঁধেছেন, যেখানে ইন্দুবালার নীরবতা, জ্যোৎস্নাময়ীর জেদ আর নন্দিতার মুখরতা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটকে পূর্ণতা দিয়েছে।

আসলে ঔপন্যাসিক কল্লোল লাহিড়ী ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’ উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন দেশভাগ, সামাজিক অবহেলা এবং সংসারের বিভিন্ন প্রতিকূলতা পার করে এক একজন ছিন্নমূল নারীদের কীভাবে বেঁচে থাকার আলাদা আলাদা পথ বেছে নিতে হয়। ইন্দুবালার যে সমাজ বা পরিবার থেকে উঠে এসেছেন, সেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর জ্ঞাতি-কুটুমবাদের বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা সহ্য করা ছাড়া তাঁর কাছে অন্য কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ইন্দুবালা সেই অন্ধকার চোরাবালিতে তলিয়ে যাননি। তিনি ছেনু মিত্রের লেনের একতলায় উনুন জ্বালিয়ে শুধু ভাতের হোটেলই খোলেননি, বরং সমাজের মূলস্রোত থেকে ছিটকে পড়া মানুষদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন এক বিকল্প পরিবার। এই পরিবারের অন্যতম সদস্য ছিল উড়িষ্যার খরাপিড়িত গ্রাম থেকে আসা ধনঞ্জয় এবং বিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা লছমী মাছওয়ালী। লছমীর হাত ধরেই ইন্দুবালার এই ঘুরে দাঁড়ানো। যে সমাজ তাঁকে একাকী, অসহায় বিধবা ভেবে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, সেই সমাজের বুকেই ইন্দুবালা এক স্বাধীন সন্তায় জীবন-যাপনে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলেন।

এই ভাতের হোটেল শুধু আর পাঁচটা সাধারণ ভাতের হোটেল ছিল না; এটি হয়ে উঠেছিল সমাজের সমস্ত নিয়ম, বেড়া আর জাতপাতের ঊর্ধ্বে এক মহামিলনের জায়গা। সন্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনের সময় যখন শহরের অলিতে-গলিতে বারুদ আর রক্তের গন্ধ, তখন পুলিশের তাড়া খাওয়া ক্ষুধার্ত ছেলেদের (যাদের মধ্যে অলোক অন্যতম) পরম আশ্রয়ের জায়গা হয়ে উঠেছিল ইন্দুবালার রান্নাঘর। পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্র যখন এই বিদ্রোহী তরুণদের ‘সন্ত্রাসী’ তকমা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন একজন সাধারণ বিধবা নারী ইন্দুবালা স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে তাদের বুকে টেনে নিয়েছিলেন। কারণ ইন্দুবালার নিজস্ব এক জীবনদর্শন ছিল—

“মা বলতো অতিথির কোনো পরিচয় হয় না। ধর্ম হয় না। তাঁরা হন ঈশ্বর ... অতিথি হন ঈশ্বর।”^৮

বলাবাহুল্য, ইন্দুবালার এই অল্পদান কোনো নিছক ব্যবসা ছিল না। এটি ছিল তাঁর ভেতরের সমস্ত না-পাওয়া, বিরহ আর শোককে সৃষ্টির আনন্দে ভুলিয়ে রাখার এক অব্যর্থ ওষুধ। ঔপন্যাসিক ইন্দুবালার এই রোজনামচার মধ্য দিয়েই সমাজ ও সময়ের এক বৃহত্তর দলিল তৈরি করেছেন। ইন্দুবালার একটি হিসেবের ‘জাবদা খাতা’ ছিল, যেখানে তিনি রোজকার বাজারের হিসেব লিখতেন। কিন্তু আসলে সেটি ছিল তাঁর স্মৃতির গোপন সিঁদুক। নাতনি সুনয়নী যখন সেই খাতাটি ছাপিয়ে বই করতে চায়, তখন ইন্দুবালা তীব্র আপত্তি করেন। কারণ সেই খাতার পাতায় পাতায় লুকিয়ে আছে তাঁর ফেলে আসা

কলাপোতা গ্রাম, প্রথম প্রেম মনিরুলের দেওয়া শুকনো ফুল, নকশাল ছেলেদের ইস্তেহার আর লছমীর দেওয়া তেজপাতা। এই খাতা তাঁর একান্ত নিজস্ব, যা আধুনিক কর্পোরেট বা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বিক্রয়যোগ্য পণ্য হতে পারে না।

ইন্দুবালাকে দিয়ে ঔপন্যাসিক যেন এক নতুন যুগের মাতৃসত্তার সূচনা করতে চেয়েছেন। যে মা নিজের সন্তানদের কঠোর অনুশাসনে মানুষ করেছেন, কিন্তু তারা বড় হয়ে উঠার পর তাদের বোঝা হতে চাননি। ছেলেরা যখন তাঁকে এই হোটেল ছেড়ে তাদের কাছে গিয়ে থাকতে বলে, তখন ইন্দুবালার অভিমানী অথচ বাস্তববাদী মন বলে ওঠে—

“ওরকমটা সবার মনে হয় রে ধনা। বোঝাকে বেশিক্ষণ মানুষ ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে রাখতে পারে না।

মনে হয় কতক্ষণে নামাবে সে মাটিতে। আমি কারো বোঝা হতে চাইনা রে।”^{১৯}

একদিকে যেমন ইন্দুবালা তাঁর অতীতকে পরম যত্নে আগলে রেখেছেন, ঠিক তার বিপরীত দিকে উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই আধুনিক প্রজন্মের সাথে তাঁর এক অদ্ভুত মেলবন্ধন। সঞ্চরী, কিংসকদের মতো আধুনিক ছেলেমেয়েরা যারা সোশ্যাল মিডিয়া আর ইন্টারনেটের যুগে বড় হয়েছে, তারাও ইন্দুবালার ভাতের হোটেলের মাটির টান আর রান্নার জাদুতে মুগ্ধ হয়ে ছুটে আসে। সঞ্চরী নামের এক মাতৃহীন তরুণীর আবদারেই উপন্যাসের শেষে এক অদ্ভুত বেদনার আখ্যান উঠে আসে। সঞ্চরী খেতে চায় ‘কচু বাটা’। আর এই কচু বাটার সাথেই জড়িয়ে আছে ইন্দুবালার পরম বন্ধু লছমীর মর্মান্তিক মৃত্যুর স্মৃতি।

এক শীতের ভোরে ইন্দুবালার হোটেলের জন্যই বড় এক মানকচু আর মাছ আনতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছিল লছমীর। মর্গে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত বন্ধুকে দেখে ইন্দুবালা ডুকরে কেঁদে উঠে বলেছিলেন—

“এমন তো কথা ছিল না রে। উনুন ধরিয়ে বসেছিলাম তোর জন্যে। তুই এলি না। কথা রাখলি না।”^{২০}

লছমীর আত্মাকে সেই কচু বাটা উৎসর্গ করে ইন্দুবালা নিজের হোটেল এই রান্না চিরতরে নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু সঞ্চরীর জেদ আর মাতৃহীন চোখের দিকে তাকিয়ে বহু বছর পর ইন্দুবালা আবার সেই কচু বাটা তৈরি করেন। আসলে ঔপন্যাসিক দেখাতে চাইলেন, মৃত্যু বা হারিয়ে যাওয়াতেই সব শেষ হয়ে যায় না। অতীত বারবার নতুন প্রজন্মের হাত ধরে নতুন রূপে ফিরে আসে।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি, সমস্ত হারানোর শোক, দেশভাগের ক্ষত, আর একাকীত্বের দহনকে ছাপিয়ে এক পরম প্রশান্তি ইন্দুবালার চোখে মুখে নেমে এসেছে। রান্নার শেষে, পড়ন্ত বিকেলে রান্নাঘরের দরজায় তিনি যেন আবার সেই লছমীর হাসিমুখ দেখতে পান। আসলে ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’ উপন্যাসটি যে কেবল দেশভাগ বা সাধারণ রান্নাবান্নার আখ্যান নয়, বরং তা শোককে শক্তিতে পরিণত করে এক প্রান্তিক নারীর ‘অল্পপূর্ণা’ হয়ে ওঠার এক মহাকাব্যিক আখ্যান, যা অন্তিম পাঠে পাঠকের মনের মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে থাকে।

সবমিলিয়ে কল্লোল লাহিড়ীর ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’ উপন্যাসটিকে কেবল একটি ভোজনালয়ের ইতিহাস বা দেশভাগের নিছক আখ্যান হিসেবে দেখলে এর প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার করা হয় না। বরং এটি শেকড়চ্যুতির তীব্র বিষাদকে স্মৃতির মোড়কে আগলে রাখার এক জীবন্ত দলিল। উপন্যাসের পরতে পরতে ইন্দুবালার জীবনে নারীসত্তার যে চরম সংকট ঘনীভূত হয়েছে— প্রথমে সমাজ ও ধর্মের দোহাই দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া বাল্যবিবাহ, এরপর এক পুরুষতান্ত্রিক, বৈরী শ্বশুরবাড়িতে মানসিক ও শারীরিক লাঞ্ছনা এবং শেষে সহায়সম্বলহীন ‘রিফিউজি’ বিধবার পরিচয়— এই নিশ্চিহ্ন অন্ধকার থেকে উত্তরণের একমাত্র মাধ্যম হয়ে ওঠে ওই ভাতের হোটেল।

ইন্দুবালার কাছে স্মৃতি কোনো বিলাসিতা বা নিছক অতীতচারণা নয়, বরং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এক শক্তিশালী হাতিয়ার। দেশভাগের ক্ষত আর স্বজন হারানোর হাহাকারকে সে রান্নার সুবাসে মিশিয়ে বেঁচে থাকার রসদে পরিণত করেছে। যে সমাজ তাকে প্রান্তিক করে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল, সেই সমাজের বুকেই নিজের অদম্য জেদ আর পরিশ্রমের জোরে সে এক স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচয় গড়ে তুলেছে। জ্যোৎস্নাময়ী বা নন্দিতার মতো মুখের প্রতিবাদী চরিত্রগুলোর ঠিক পাশেই ইন্দুবালার এই নীরব যাপন আসলে পিতৃতন্ত্র ও দেশভাগের জাঁতাকলে পিষ্ট এক সাধারণ নারীর অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প।

সমস্ত শোক, বঞ্চনা আর একাকীত্বের দহনকে পেছনে ফেলে, ভাতের হোটেলের গনগনে উনুনের আঁচে নিজের আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করে তার এই ‘অন্নপূর্ণা’ হয়ে ওঠাই হল নারীসত্তার এক প্রকৃত উত্তরণ, যা বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নিঃসন্দেহে এক চিরন্তন মাইলফলক হয়ে থাকবে।

Reference:

১. লাহিড়ী, কঞ্জোল, ইন্দুবালা ভাতের হোটেল, সুপ্রকাশ, কলেজ স্কোয়ার, সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা ১২, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ২০২০, পৃ. ২০
২. তদেব. পৃ. ৫৭
৩. তদেব. পৃ. ৩৭
৪. তদেব. পৃ. ১৯
৫. তদেব. পৃ. ৮
৬. তদেব. পৃ. ১০৩
৭. তদেব. পৃ. ১১৭
৮. তদেব. পৃ. ২৮
৯. তদেব. পৃ. ১৪১
১০. তদেব. পৃ. ১৫৫